চট্টগ্রাম • সোমবার • ১৫ আগস্ট ২০২২ • ৩১ শ্রাবণ ১৪২৯ • ১৬ মহরম ১৪৪৪ ৮ পৃষ্ঠা • মূল্য ৭ টাকা চট্টগ্রাম • রেজি. নম্বর ৪৫০ • বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৩৪৫ suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

প্রতিটি প্রভাত হোক সুপ্রভাত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

প্রসঙ্গ : বঙ্গবন্ধু হত্যা ও প্রতিবাদী আন্দোলন

মুহাম্মদ শামসুল হক »

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত ও হৃদয়বিদারক জঘন্য ঘটনা। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু ছাড়াও তাঁর পরিবারের অন্য

▶ *২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলাম*

চট্টগ্রাম ● সোমবার ● ১৫ আগস্ট ২০২২ ● ৩১ শ্রাবণ ১৪২৯ ● ১৬ মহরম ১৪৪৪ ৮ পৃষ্ঠা ● মূল্য ৭ টাকা চট্টগ্রাম ● রেজি. নম্বর ৪৫০ ● বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৩৪৫ suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

প্রতিটি প্রভাত হোক সুপ্রভাত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

প্রসঙ্গ : বঙ্গবন্ধু হত্যা ও প্রতিবাদী

▶ *১ম পৃষ্ঠার পর*

সদস্য–সদ্যবিবাহিত পুত্রবধূ, এমনকি ছয়-সাত বছর বয়সী শিশু রাসেলসহ নিকটাত্মীয়, যাঁদের হাতের নাগালে পেয়েছে তাঁদেরও রেহাই দেয়নি। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা বেঁচে গিয়েছিলেন, কারণ সেদিন তাঁরা দেশের বাইরে ছিলেন।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর থেকে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য যারা বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করেছে তাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড, পাকিস্তানি ভাবধারায় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর পুনর্বাসন-প্রচেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদের তোষণ নীতির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল! স্বস্তির কথা, সব নেতিবাচক অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার আদালতের রায়ে হত্যাকারীদের বড় অংশের শাস্তি কার্যকর করেছে। যদিও আপাত তথ্য-প্রমাণের অভাবে ঘটনার নেপথ্যের কলাকুশীলবদের অনেকে বিচারের আওতার বাইরে থেকে গেছে ।

অনুসন্ধান ও তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে দেখা গেছে, কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির অবস্থান ও সামরিক ব্যক্তির পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের আকস্মিকতায় সাধারণ মানুষসহ নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রথমে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও দেশের অনেক জায়গায় সেদিনই প্রতিবাদ-মিছিল হয়েছিল। পরবর্তী দু-তিন মাসের মধ্যে দেশের একটি বড় অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কর্মসূচি যা একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল-যদিও তা উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা না পাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিরোধ গড়ে না ওঠার কারণও পর্যালোচনা করা দরকার।

ঘাতকচক্র । অন্যদিকে ঘাতকেরা সামরিক আইন ও কারফিউ জারির মাধ্যমে সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ভারী অস্ত্রসহ ট্যাংক ও সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে শহরময় টহল দিয়ে ভীতিজনক পরিবেশ তৈরি করে। ঘটনার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনছুর আলী, কামরুজ্জামানসহ জাতীয় পর্যায়ের নেতা, এমনকি জেলা পর্যায়ে যাঁরা সাধারণ নেতাকর্মীসহ জনগণের মধ্যে প্রতিরোধের নির্দেশনা দিতে পারতেন, তাঁদের বেশিরভাগ ছিলেন বন্দি অথবা ঘেরাও হয়ে কড়া পাহারায়। অনেকেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের আকস্মিক মৃত্যু, নিজেদের বন্দিত্ব এবং ঘাতকদের হিংস্র মনোবৃত্তির কথা জেনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কেউ কেউ জীবনের মায়ায় ভীত হয়ে আত্মগোপন করছিলেন। কেউ কেউ স্বেচ্ছায়, অনেকে সশস্ত্র সৈন্যদের বন্দুকের নলের মুখে যোগ দিয়েছিলেন মোশতাকের মন্ত্রিসভায়। দুর্বল চিত্তের নেতাদের এভাবে মোশতাক মন্ত্রিসভায় যোগদানের ফলে সাধারণ নেতা-কর্মীদের অনেকেই মনে করেছিলেন, বিভ্রান্ত কিছু সৈনিক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও পরিস্থিতি ও সরকার আওয়ামী লীগেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে শীর্ষ পর্যায়ের কাউকে পাওয়া না গেলেও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে ওইদিনই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রাম, বরগুনা ও কিশোরগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায়। হত্যাকাণ্ডের ৩-৪ দিনের মাথায় মিছিল হয় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে। ছাত্র-কর্মীদের চেষ্টার ফলে ২০-২১ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন ও কলাভবন এলাকায় চলে সমাবেশ, মিছিল-স্লোগান। পরদিন আবারও মিছিল করতে গিয়ে সামরিক সরকারের সমর্থক ও পুলিশি হামলার শিকার হন ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা। এরই মধ্যে গোপনে সংগঠিত হয়ে ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আশপাশের এলাকা ঘিরে মিছিল সমাবেশ, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ বাকশালভুক্ত ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এতে শিক্ষার্থী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। সেখানে উপস্থিত অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ওই দিন চট্টগ্রামেও কয়েক জায়গায় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া, শেরপুর, পাবনা, ভৈরব, মুক্তাগাছায় প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়েছে। তবে সবকটি মিছিল সমাবেশই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাধার কারণে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। কোথাও কোথাও সেনাবাহিনীর হামলার কারণে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরই ফাঁকে ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। গঠিত হয় জাতীয় মুক্তিবাহিনী। অল্প সংখ্যক বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক সদস্য নিয়ে এই বাহিনী কাজ শুরু করলেও গোপন সাংগঠনিক তৎপরতার ফলে এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৬-৭ হাজার, কারও কারও মতে, আরও বেশি প্রতিবাদী যোদ্ধা এতে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা। ছিলেন নারায়ণগঞ্জের নাসিম ওসমান (পরে সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী), আবদুল লতিফ সিদ্দিকী (প্রাক্তন মন্ত্রী), তৎকালীন ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দীপঙ্কর তালুকদার (বর্তমান এমপি), নগর ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক আবদুর রউফ সিকদার, ঢাকা আইডিয়াল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সামাদ পিন্টু, শামীম মোহাম্মদ আফজাল (প্রয়াত মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন), জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সেলিম তালুকদার, যুগল হাসমীসহ অনেকে।

প্রতিরোধ যোদ্ধারা নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে কখনো বাংলাদেশ, কখনো ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী ও বিডিআরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাদের একটি গ্রুপ খন্দকার মোশতাক আহমদকে হত্যা করার জন্য ঢাকা এসে ধরা পড়ায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

একইভাবে চট্টগ্রামের তৎকালীন ছাত্র ও যুবনেতা, একাত্তরে চট্টগ্রাম শহর গেরিলা বাহিনীর সংগঠক মৌলবি সৈয়দ আহমদ, এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী (চট্টগ্রামের প্রয়াত সিটি মেয়র), যুদ্ধকালীন বিএলএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার এসএম ইউসুফ তাঁদের অনুসারীদের সংগঠিত করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধমূলক নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধাসহ যুব ও ছাত্রলীগের কয়েকশ নেতাকর্মী ক্রমান্বয়ে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। এঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় মূলত চট্টগ্রাম মহানগরসহ বিভিন্ন থানা এলাকায়। মৌলবি সৈয়দ একটি কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে লিবিয়া গিয়ে খুনিদের হত্যা করার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। ৭৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলমান ওই যুদ্ধে দুপক্ষেরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য হতাহত হয়।

প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের শুরুর দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্তদের মধ্যে ছিলেন, আ র উবায়দুল মুকতাদির, মাহবুব জামান, সাজেদা চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, এস এ মালেক, ওবায়দুল কাদের, ইসমত কাদির গামা, বাহলুল মজনু চুন্নু, খ ম জাহাঙ্গীর, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সিরাজুল হক মিয়া, আবদুল্লা আল হারুন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, এম এ মান্নানসহ অনেকে।

যতদূর জানা যায়, প্রতিবাদী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রণকৌশলে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। কারও কারও লক্ষ্য ছিল হত্যাকারী ও তাদের মদতদাতা সামরিক কর্তৃপক্ষকে সশস্ত্র উপায়ে হটিয়ে নিজেদের কর্তৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে অনেকের লক্ষ্য ছিল কিছুটা সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখার পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক বৈঠক-সমাবেশ, লিফলেট বিতরণ, দেয়াল লিখন ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা-যাতে জনমনে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে দলকে সংগঠিত করে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। সে সময় পোস্টারে-মিছিলে স্লোগান ছিল 'এক মুজিব লোকান্তরে-লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে', 'মুজিব হত্যার পরিণাম-বাংলা হবে ভিয়েতনাম', আমরা সবাই মুজিব হবো-মুজিব হত্যার বদলা নেবো', ইত্যাদি। সশস্ত্র সংগ্রামে প্রয়োজনে প্রতিবেশি দেশের সহযোগিতা ও সমর্থনের ওপরও অনেকটা নির্ভরশীল ছিলেন সংশ্লিষ্ট নেতারা। কিন্তু তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের আমলে কিছুটা সমর্থন পেলেও ৭৭ সালে মোরারজী দেশাইয়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা সেই সমর্থন তুলে নেয় এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সেনাবাহিনী ও বিডিআরের কাছে হস্তান্তর করে। ফলে সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ কার্যক্রম চলে আরও বছরখানেক।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দিন থেকেই সামরিক সরকার এ ধরনের প্রতিবাদ প্রক্রিয়া যে ঘটবে তা আঁচ করতে পেরে দেশব্যাপী নেতা-কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু করে। প্রতিরোধযুদ্ধে পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে কয়েকশ যোদ্ধা। তাঁরা নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। সব মিলিয়ে মারা যান প্রায় ১০০ জন। গ্রেপ্তার ও আত্মগোপনে থাকা অনেকের বিরুদ্ধে নানা রকম মামলা দায়ের করে সরকার পক্ষ। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের সেনা ক্যাম্পগুলোতে কিছু সামরিক কর্মকর্তা গ্রেপ্তারকৃতদের বঙ্গবন্ধুর দালাল এবং সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেছেন মর্মে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে অমানবিক নির্যাতন করেন। অন্তত ১৫ জন ভুক্তভোগীর বর্ণনা অনুযায়ী টর্চার সেলে তাঁদের এমন নির্যাতন করা হয়, যা মনে পড়লে এখনো আঁৎকে ওঠেন তাঁরা। দেশের প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদকারীদের ধরে নিয়ে কম-বেশি নির্যাতন ও ২-৪ বছর কারাবন্দি করে রাখা হয়। এরকম নির্যাতনে ঢাকার একটি কেন্দ্রে নির্যাতনে শহীদ হন একাত্তরে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মৌলবি সৈয়দ আহমদ। এ ছাড়া, অনেকে গ্রেপ্তার এড়িয়ে ৭৫ থেকে ৮১ সাল পর্যন্ত হুলিয়া মাথায় করে এখানে সেখানে আত্মগোপনে থেকে দুঃসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হন। কিন্তু সামরিক সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে কোনো সংবাদ মাধ্যমে এসব তৎপরতার কোনো খবর প্রকাশ পায়নি। এছাড়া, এখনকার মতো বেসরকারি কোনো যোগাযোগ মাধ্যম না থাকায় সেই প্রতিবাদ-আন্দোলনের ইতিহাস চাপা পড়ে যায়, থেকে যায় সাধারণ মানুষের অগোচরে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অনেকটা গোপনে এবং বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বঙ্গবন্ধু হত্যার এই প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলে সারা দেশে দিশেহারা, ঝিমিয়ে পড়া বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে নতুন করে সাহস ও প্রাণ ফিরে পায়। ফলে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলে সংশ্লিষ্ট সবাই দলকে পুনর্গঠনে উৎসাহী ও উদ্যোগী হন, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো অনেকটা সহজ হয়। -পিআইডি ফিচার (সংক্ষেপিত)

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক